একাদশ অধ্যায়

সাহবাগে স্বতঃস্ফূর্ত নমাজ পাঠ

কলিকাতায় কয়দিন থাকিয়া ঢাকা গেলাম। সাহবাগে একদিন নাচঘরে কীর্তন হইতেছে ইহার ভিতর শরীরটা উঠিয়া কি এক অস্বাভাবিক ভাবে বাহিরের দিকে যাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সকলে পিছনে পিছনে খোল করতাল সহ আসিল। জ্যোতিষ ও নিরঞ্জন একটি মুসলমানের সঙ্গে একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল। আমি বরাবর সেখানে গেলাম। মুসলমানটির পিঠ স্পর্শ করিয়া চলিতে ইঙ্গিত করিয়া আমি আগে আগে চলিতে লাগিলাম, মুসলমানটিও আমার পিছু পিছু আসিল। অন্যরাও ছিল। বাগানের কিনারায় বড় কবরের নিকট গেলাম ও দরজা খুলিতে ইঙ্গিত করিলাম। আমি ভিতরে গেলাম, মুসলমানটিও আমার সহিত গেল। যাইতেই দেখি মুখ দিয়া নানা শব্দাদি উচ্চ কণ্ঠে বাহির হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠা বসা, কানে হাত দেওয়া প্রভৃতি অঙ্গাদিরও নানাবিধ ক্রিয়াদি হইল। পরে শুনিলাম মুসলমানেরা নমাজ যেইরূপে করে, এ শরীরেরও সেইসব অনুষ্ঠানাদি হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানটি তদনুসারে করিয়াছিল। পরে শুনিলাম তাহাদের নাকি নিয়ম একজন নমাজ পড়িলে সঙ্গীদেরও পড়িতে হয়। ঐখান হইতে আবার নাচঘরে ফিরিয়া আসিলাম। মুসলমানটিও আসিয়া কীর্তনে যোগ দিল। তাহাকে বলিলাম — ঐ কবরে সিন্নি দেওয়া হয়। আজ বোধ হয় সে লোকটি আসে নাই, তুমি দাও। সে সিন্নি নিবেদন করিল এবং আমাকে প্রসাদ স্বরূপ বাতাসা খাওয়াইয়া দিল। হরিলুট হইলে, সেও প্রসাদ পাইল। জ্যোতিষ বলিয়াছিল যে সে লোকটি গোঁড়া মুসলমান ছিল।

সাহবাগের মালিক প্যারীবানু ঢাকা আসিল। সাহবাগে আসিয়া কালী কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া সে কালীর গলায় একটি সোনার কণ্ঠমালা দিয়া প্রণাম করিল।

তাহার ছেলেমেয়ের বিবাহে এ শরীরকে ১০ গাছা সোনার চুড়ী পরাইয়া দিয়াছিল। ঢাকা থাকা কালীন সে কখন কখন সাহবাগে

বেড়াইতে আসিত। একদিন সে ছেলে বৌ মেয়ে ও জামাই নিয়া গাছতলায় বসিয়া এ শরীরের রান্না পোলাও, তরকারি প্রভৃতি খাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিল।

আর একদিন বলে — আপনি ত এই কবরে নমাজ পড়িয়াছেন, আজ আমাদিগকে দেখান। বড়ই আগ্রহ করিতে লাগিল। বলিলাম — এ শরীর ত তোমাদের মত ইচ্ছায় কিছু করে না, ভিতরে যাইতেছি। যদি হইবার হয় শুনিবে। তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। কেননা তাহাদের ভিতর মেয়েদের কবরে যাওয়া নিষেধ। এ শরীর ভিতরে গেলে পূর্বের মত মুখ দিয়া আরো কি কি সব বাহির হইল। প্যারীবানুর ছেলের বৌ কিছু কিছু বুঝিল এবং এক পুস্তকের নাম করিয়া বলিল যে ঐ পাঠের সবই ইনি বলিয়াছেন।

সাধকের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে সতর্কবাণী

আর একটি কথা এই — সাধক যখন বিভূতি লাভ করে, তখন তাহার শক্তি ক্ষয় ও বৃদ্ধিভাব থাকা পর্যন্ত সে যাহা প্রকাশ করে তাহার শক্তিক্ষয়ের প্রতিকার স্বরূপ, সঙ্গে সঙ্গে কর্ম করিতে হয়। এ শরীরের ত সবই আপনা আপনি, আপন খেয়ালে খেলিয়া যাইত। আর জিজ্ঞাসার কারণগুলিও মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইত। কেবল বাহ্যভাবজনিত যে সব অলৌকিকতা তাহা প্রতিকারের কোন অপেক্ষা রাখে না কিন্তু। এ শরীরের আপনা আপনি স্বভাবতই তোমাদের এক একটা দিক নিয়া খেলিয়া যাইতেছে।

ভোলানাথের মাতৃপূজা

ইতিপূর্বে যখন কামাখ্যায় যাওয়া হয়, তখন ভোলানাথ একবার এ শরীরকে তথায় পূজা করিয়াছিল। সেই সময় বিনা আহ্বানে অনেক কুমারী সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং যতক্ষণ পূজা হইয়াছিল তাহারা ওখানে হাসিয়া খেলিয়া কাটাইয়াছিল। ঢাকায় উত্তমা কুটীরে ভোলানাথ আবার এই শরীরটাকে পূজা করিল। ঐ সময়ে পূজার মন্ত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে এই শরীরটা কি একটা ভাবে মাটিতে পড়িয়া থাকিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐভাবে কাটিয়া যাইত।

ভোলানাথের তারাপীঠ গমন

ঢাকায় উত্তমা কুটীরে কয়েক মাস কাটাইবার পর ভোলানাথকে সঙ্গে করিয়া সিদ্ধেশ্বরী আসিলাম। তাহাকে কালীমন্দির সংলগ্ন ছোট কোঠার ভিতর বসিবার কথা বলিলাম। তিন দিন বসিয়া ভোলানাথ বলিল — আমি মাথা ছাড়া এক কালীমূর্তি দেখিতেছি। উহা কি বল? তাহাকে বলিলাম — তুমি তারাপীঠ যাও। তারাপীঠের নাম পূর্বে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে বিগ্রহাদি কি আছে জাগতিক হিসাবে জানিতাম না। যোগেশকে সঙ্গে করিয়া ভোলানাথ তারাপীঠ গেল।

এইদিকে এ শরীরের এক খেয়াল হইল, প্রায় সারাদিনরাত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সেই ছোট কোঠায় যাইয়া থাকিতে আরম্ভ করিল। বেলা ৪টার সময় বাহিরে আসি, সামান্য যাহা কিছু খাই, রাত্রি ৯/১০টা পর্যন্ত বাহিরে থাকিয়া আবার সে কোঠায় প্রবেশ করি।

এইদিকে কিছুদিন পরে ভোলানাথ এ শরীরকে নিবার জন্য তারাপীঠ হইতে সুরেনকে পাঠাইয়া দিল। সেইদিন ঢাকা স্টেশনে হঠাৎ আমার যাইবার কথা শুনিয়া অনেক পুরুষ ও মেয়ে দেখা করিতে আসিল আর কান্না জুড়িয়া দিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে এ শরীরও হাউ হাউ করিয়া হাত পা নাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, যেন শরীরের সর্বাঙ্গেই কান্না। জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি আসিয়া বলে, মা! এ কি করিতেছেন! স্টেশনে এত লোক ইহারা কি বলিতেছে? কাহার কথা কে শুনে। আমি আমার ভাবেই আছি। আমার এই ভাব দেখিয়া আমাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেই চোখের জলে ভাসিতে লাগিল। বাহিরের লোকেরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ বলাবলি করিল যে বোধ হয় জোর করিয়া মেয়েটিকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া যাইতেছে।

এ শরীরের ত যখন যাহা হয় চূড়ান্ত; হাসিও আবার এইরূপই, করা কি! পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। রাস্তায় ও নারায়ণগঞ্জ স্টীমারে গিয়াও কান্নার ভাব চলিয়াছিল। পরে আস্তে আস্তে পড়িয়া রহিলাম।

কলিকাতা পেঁ ৗছিয়া তারাপীঠ গেলাম। দেখিলাম ভোলানাথের জপ ধ্যানে সুন্দর ভাব, বেশ একটু তন্ময়তাও। সারা দিনরাত্রি

তারামায়ের মন্দিরের বারান্দায় পড়িয়া থাকে। মুখে মশামাছি বসিলেও খেয়াল নাই। শীত সত্ত্বেও গায়ে কাপড় নাই। আগে হুঁকা সর্বদা মুখে লাগা থাকিত, তখন দেখি সে খেয়ালও বিশেষ নাই। আমরা যখন যাইয়া পেঁ ৗছিলাম তখন রাত্রির খাবারের জন্য উঠিয়াছে। আমাকে বলিল — আমি যে সিদ্ধেশ্বরীতে মাথা ছাড়া কালী দেখিয়াছি তাহা এই তারা মায়ের মূর্তি। কাল সকালে স্নানের সময় দেখিও। একখানি পাথর, তাহাতে ইহারা মুখ লাগায়। বলিলাম — তোমার তারাপীঠে আসার কথা, আমার ভিতর হইতেই উঠিয়াছিল। এইরূপ মূর্তির কথা আমি আগে কিছুই শুনি নাই।

ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কোঠায় যেইরূপ দেখিয়াছিল এখানকার মূর্তিও প্রায় সেইরূপ দেখায় তাহার বেশ উৎসাহ ও আনন্দ হইয়াছিল। এখানে আসিয়া অবধি তারা মায়ের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু খায় না। সর্বদা জপ ধ্যানে এক অখণ্ড ভাবের ধারায় আছে এবং রাখিতেও চেষ্টা।

এইরূপে দশদিন গত হইল। শেষদিন দেখি কি! অনেক রাত্রে ভোলানাথের কেমন একটা ভাব আরম্ভ হইয়াছে। সর্বাঙ্গ ওলট পালট। খুব বড় বড় আওয়াজ করিয়া বলিতেছে — তারা মায়ের কৃপা পাইয়াছি। পাণ্ডারা মনে করিল, তারাপীঠে যাহারা সাধন ভজন করিতে আসে, তাহারা কেহ কেহ প্রথম একটু ক্ষেপিয়া উঠে — পরে শান্ত হয় — ইহাও সেই রকম একটা ভাব। তারা মা ভোলানাথকে নিয়া কি ভাবে খেলা করেন তাহা বলিতে লাগিল ও শরীরের অনেক ক্রিয়া প্রকাশ হয়। এইরূপে রাত্রি শেষ হইল। সকাল বেলা আসিয়া শিবমন্দিরে পড়িয়া রহিল। সেইদিন আর তামাক খাইল না। বেলা ৩/৪টা হইতে মুখে লালা পড়িতে লাগিল। ইহার পর হইতে তামাক খাওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। ২/১ দিন তথায় থাকিয়া আমরা কলিকাতা চলিয়া আসিলাম।

যজ্ঞোপবীত গ্রহণ

একদিন দেখি কুশারী মহাশয়ের গলায় পৈতা নাই। জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল ছিঁড়িয়া, গিয়াছে, দিব দিব বলিয়া আর দেওয়া হয় নাই। তাহাকে বলিলাম — তবে ছেলেরা কি শিখিবে?

শিগ্গির সকলে পৈতা নিন। একদিন খুকুনী এ শরীরকে স্নান করাইতেছে। গলার সোনার সরু হারটা খুলিয়া রাখিয়াছে। স্নানের পরে যখন হারটা গলায় দিতে গেল তখন হারটা পৈতার মত হইয়া গলায় পড়িল। মাপিয়া দেখিলাম সামবেদীর পৈতার মাপে আছে। কি একটা ভাব হইল। বলা হইল, বেশ ত পৈতার মাপেই আছে। ঐ ভাবেই হারটা ঐ সময় রহিয়া গেল। পরে সন্ধ্যার সময় এক খেয়াল হইল যে আমি পৈতা নিব। গলার সেই সোনার হারটি খুলিয়া বেঙ্গীর হাতে দিলাম। সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছিল, তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা হাত পা ধুইয়া শুদ্ধ হইয়া আমাকে গায়ত্রী শুনাও। সে সময় সোনার হারটি পৈতার মত গলায় দিলাম। এই গায়ত্রী পড়া হইলে উপনয়নের সময় যেইরূপ হয় বেঙ্গী সেই ভাবে ভিক্ষা আমার কাপড়ে বাঁধিয়া দিল। খাওয়া ত সামান্য ফল দুধই হয় কাজেই আহার সংযমের ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইয়া গেল। পরদিন কলিকাতা হইতে যজ্ঞের অগ্নি সে বাসায় আনা হইল ও গঙ্গায় গিয়া তাহাদের ৫ জনের গলায় নুতন পৈতা দেওয়া হইল।

একদিন নন্দুর গলায় পৈতা না দেখিয়া বলিয়াছিলাম — ধর! তুই আমার পৈতাটি (সোনার) নে। সে স্বীকার করিল না। রেবতীবাবুকে একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলাম — আমার বাবা যখন, তবে ত ব্রাহ্মণ। এই পৈতাটি নাও। সেও নিল না। এ সব নানা রকম খেলা খেলিয়া শরীরটা ঢাকা চলিয়া আসিল।

কালীমূর্তির স্থানান্তর

কালী বিসর্জন না দিয়া রাখা হইলে, প্রথমতঃ যে ঘরে ছিল, সে ঘর হইতে সরাইয়া অন্য ঘরে নেওয়া হইল। সে সময় যোগেশবাবু (বন্দ্যোপাধ্যায়) বলিল — এ কালীর কি যে গতি হয় জানি না। তুলিতে শরীর কাঁপে, পাছে ঝর ঝর করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহারা খুব ভয়ে ভক্তিতে সরাইয়া ছিল। তাহার পর যখন আমাদের অনুপস্থিতিতে সাহবাগ হইতে মোটরে টিকাটুলী লইয়া যায়, তখনো কেবল কালীর উপর ভরসা রাখিয়াই গিয়াছিল। মাটির মূর্তি, বছর হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার না

হয়। পরে আবার উত্তমা কুটীরে আনে, সেখান হইতে সিদ্ধেশ্বরী আনিতে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে একটি কাঠের আলমারী করিয়া উহার ভিতর কালীমূর্তি রাখা হইয়াছিল।

আগ্রহ জনিত কর্মের সুফল

উত্তমা কুটীরে থাকাকালীন আমরা একবার কুমিল্লা যাই। তথায় কীর্তনাদিতে খুব আনন্দ হয় এবং অনেক লোক সমাগম হয়। আমরা উত্তমা কুটীরে ফিরিলে, নিকটস্থ বাসার অক্ষয়বাবুর মেয়ে একখানি বন্ধ চিঠি নিয়া আসিল। সে বলিল কয়েকদিন হয়, সে যখন স্নান করিতে পুকুরে যায়, তখন এই শরীরের নামে ঐ চিঠিখানা পুকুরের পাড়ে পড়িয়া আছে দেখে। সে আর ধরিল না। কিন্তু যখন দেখিল ৩/৪ দিন পর্যন্ত পড়িয়াই আছে, তখন সে ভাবিল কেহ হয়তো ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছে, আজ সে তাহা লইয়া আসিয়াছে। চিঠিখানি খুলিয়া দেখি, কুমিল্লা হইতে একটি ছেলে তাহার বুকের রক্ত দিয়া কয়েকটি ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রাণের আবেগ নিবেদন করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, মানুষের আগ্রহ থাকিলে কোন কর্ম বিফলে যায় না।

আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ঢাকা ত্যাগ

আশ্রমের জন্য জ্যোতিষের প্রথম ইচ্ছা জাগে। এ শরীরকে বলিলে তাহাকে বলিলাম — জগৎ ভরাই ত এই শরীরের একটি মাত্র আশ্রম। জ্যোতিষ বলিল — আপনাকে হরিদ্বারে এক কুটিয়া করিয়া দিলেও ত আপনি থাকিতে পারেন। কিন্তু আশ্রম আমাদের জন্য প্রয়োজন। দেখিলাম তাহার প্রবল আগ্রহ। সাহবাগে যখন লোকজনের আসা বারণ হইল, তখন আমি গেটে আসিয়া কখনও কখনও সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতাম। একদিন সন্ধ্যার সময় জ্যোতিষ আসিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি। আমি ও ভোলানাথ তাহাকে নিয়া মাঠে গিয়া বসিলাম। সে আবার আশ্রমের কথা তুলিল। তখন তাহাকে বলিলাম — যদি তোমরা তোমাদের জন্য আশ্রম একান্তই করিতে চাও, তবে ঐ ভগ্ন দেওয়াল যুক্ত ছাড়া বাড়ীতে

(বর্তমান আশ্রম) করিবার চেষ্টা করিও। ভোলানাথের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম — উহা তোমাদের পুরানো স্থান। তাহার পরে জ্যোতিষের ব্যারাম হইল।

যখন সে সুস্থ হইয়া আবার ঢাকা ফিরিয়া কাজে হাজির হইল, তখন একদিন বলে নিরঞ্জন ও আমি আজ ৩ বৎসর ধরিয়া আশ্রমের চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলাম না। নানারকম বাধাবিঘ্ন লাগিয়াই আছে। এখন নিরঞ্জন বলে, আশ্রমের প্রস্তাব কোথাও করিতে লজ্জা বোধ হয়। আপনি ইচ্ছা না করিলে কিছুই হইবে না। সকলের মঙ্গলের জন্য আপনার ইচ্ছা আসুক, এই প্রার্থনা করি।

ইহার পর আমাদের তারাপীঠ যাওয়া হয়। ফিরিয়া আসিলে কলিকাতায় বিনয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তখন তাহাকে বলিলাম — তোমরা যে আশ্রম আশ্রম সর্বদাই কর, তোমাদের যদি দরকার মনে হয়, তবে ঢাকা গেলে জ্যোতিষকে বলিও তাহারা ঐ রমনার জায়গাটি যেন আবার চেষ্টা করে। তবে এ শরীরের কথা এই — তোমরা আশ্রম কর আর নাই কর, এ শরীরকে যে চার দেওয়ালের মধ্যে সর্বদার জন্য বাঁধিয়া রাখিবে, তাহার কি হইবে না হইবে কিছুই কিন্তু ঠিক নাই। যাহা হইয়া যায়। তোমাদের আশ্রম করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, এখন তোমাদের যাহা ইচ্ছা।

পরে রমনার স্থানটি ঠিক হয়। জন্মোৎসব সিদ্ধেশ্বরী হইতেছে। এ শরীরের কি এক খেয়াল হইল উৎসবের মধ্যেই নূতন স্থানে যাইতে হইবে। জ্যোতিষকে ইহা জানাইলাম। সে রাতদিন লোক খাটাইয়া আশ্রমে একখানি ঘর করিয়া দিল। ১৯শে বৈশাখ রমনার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। এই শরীরের কিন্তু আশ্রম করা সম্বন্ধে কোনই কথা নাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জোড়াই একখানি আশ্রম। সেইখানে সেই একেরই নিত্য নিবাস।

সেইবারও তিথি ও তারিখ মিলিয়াছিল। এই শরীরটা যখন তোরা পাইয়াছিলি তখনও সেই তারিখ ও তিথি মিলিয়া গিয়াছিল। অর্থাৎ ১৯শে বৈশাখই কৃষ্ণা চতুর্থী ছিল।

ইহার অনেকদিন পূর্ব হইতেই ভোলানাথকে বলিতাম — তুমি ঢাকা থাকো, আমি কয়েকদিন ঘুরিয়া আসি। তাহা শুনিয়া তিনি রাগ করিতেন। যেই দিন সন্ধ্যায় রমনার আশ্রমে প্রবেশ করিলাম

— সেই রাত্রে বাউল ফুলের মালা দিয়া রকমে রকমে আশ্রম সাজাইল। সকলে মিলিয়া রাত্রি প্রায় ২টা পর্যন্ত খুব আনন্দ করিল। পরদিন প্রাতে ঘরের বাহির হইতেই দেখি শরীরের কেমন একটি অবশ অবস্থা। এই শরীর আর ঘরে গেল না। সারাদিন বাহিরেই পড়িয়া রহিল। সেইদিন ভোগের ব্যবস্থা হইল। বহু লোক আসিয়া প্রসাদ নিল। এই শরীর প্রায় সন্ধ্যায় উঠিয়া পিতার সঙ্গে কিছু খাইল। ভোলানাথ নিরঞ্জনের বাসায় গেল।

এই শরীরের কেমন একটা ভাব আসিল, বলিয়া উঠিলাম — আমি এখনই কোথাও যাইব। সকলে বলিল — কাল সন্ধ্যায় এই আশ্রমে আসা হইল। এত করিয়া আশ্রম করা হইল আর আজই তুমি চলিয়া যাইবে? একি হয়? আমরা যাইতে দিব না। আশ্রমে তখন শশাঙ্কবাবু প্রভৃতি ১০/১২ জন ছিল। সন্ধ্যার পর একটু কীর্তন হইয়াছিল পরে অনেকে বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। এই সব কথা চলিতেই এই শরীরের মুখ হইতে মন্ত্র ও স্তোত্র বাহির হইতে লাগিল, অনেকে তাহা লিখিতে আরম্ভ করিল। তখন বলা হইল — যখন লিখিয়া নিলে তখন ইহা তোমরা প্রত্যহ পাঠ করিও। আরও বলা হইল — যেখানে তোমরা এখন কীর্তন করিয়াছ তাহার ঐ দিকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলাম — পূর্বে যে কথিত আছে উগ্র তপস্বীদের কথা, ঐ স্থান পূর্বোক্ত তপস্বীদের মধ্যে একজনের বিশেষ স্থান। তাঁহার তত্ত্বে স্থিতিলাভ হইয়াছিল। তিনি এখানকার তপস্বীদের পূজ্য ছিলেন। সেই সময় এই কথাটা একটু অস্পষ্ট ও সংক্ষেপ হওয়ায় সকলে ইহা বুঝিতে পারে নাই। সেই তপস্বীর সঙ্গে ঐ স্থানের কি সূত্র ছিল, তাহা আর বলা আসিল না। সেই জন্য সেখানে একটি বাতি দিবার কথাও বলা হইল।

এই শরীরটা আশ্রমের বাহিরে চলিয়া আসিয়া মাঠে বসিল। শরীরের পিতাকে ডাকাইয়া বলিলাম — আমার সঙ্গে আপনাকে যাইতে হইবে। আশুকে খোঁজ করিলাম। তাহাকে না পাওয়ায় সীতানাথও সঙ্গে যাইবে স্থির হইল।

ভোলানাথ ও জ্যোতিষ আমার যাওয়া সম্বন্ধে শশাঙ্কবাবুর বাসায় খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি আশ্রমে আসিল। ভোলানাথকে আমার যাওয়ার কথা বলিলে কেবল 'না' 'না' করিতে লাগিল। তখন কি এক প্রবল বেগে এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল — যদি

যাইতে না দাও তবে এ শরীরের কি হইবে ঠিক নাই। ইহা শুনিয়া রাগের ভাবে বলিল — যাও।

এ শরীর এই কথা শুনিবামাত্র স্টেশনের দিকে চলিল। পিছে পিছে সকলে আসিল। ভোলানাথ আশ্রমে রহিল। কতক্ষণ পর দেখি ভোলানাথও জ্যোতিষকে সঙ্গে করিয়া স্টেশনে আসিয়াছে। আমরা গাড়ীতে উঠিলাম। খুকুনী আসিয়া বলিল — মা! আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। বলিলাম — না। জ্যোতিষ আসিয়া বলিল — আমিও যাইব। তাহাকেও না করা হইলে সে বলিল — বাবা আমাকে যাইতে বলিতেছেন। আপনি যদি আমাকে আপনার কামরায় না নেন, তবে অন্য কামরায় যাইয়া বসিতে বলিতেছেন। এই সব কথা হইতে হইতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। ভোলানাথের আদেশ পালনের জন্য জ্যোতিষ আমাদের কামরায় বসিয়া পড়িল। গাড়ীতে বসিয়া শুনিলাম ভোলানাথ এ শরীরের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতেছে।

গাড়ী পরদিন ভোরে মৈমনসিং পৌঁছাইল। মৈমনসিং যাইয়া জ্যোতিষকে বলিলাম — তুমি ঢাকা চলিয়া যাও, এ শরীর কোন পাহাড়ের দিকে যাইবে। সে বলিল — বাবা আমাকে আপনার সঙ্গে পাঠাইয়াছেন, আপনাকে অনির্দিষ্ট এই ভাবে ফেলিয়া আমি কি করিয়া যাই। এক বৃদ্ধ পিতাকে নিয়া আপনি এই বর্ষার দিনে কোথায় যাইবেন? যদি কোথায়ও যাইতে হয় নিকটে আদিনাথ, কক্স বাজার বেশ ভাল স্থান। একান্ত, পাহাড় ও সমুদ্র দুইই আছে, তথায় চলুন। তখন খেয়াল আসিতেছিল সে চলিয়া গেলে পরে আমি অন্য একস্থানে চলিয়া যাইব। কিন্তু উপস্থিত তাহা হইল না। বলিলাম — যাই হোক, চল। শেষে চট্টগ্রাম রওনা হওয়াই স্থির হইল।

রাত্রে আশুগঞ্জ স্টেশনে খুব ঝড় বাতাস আরম্ভ হইল। এ শরীর বলিল — আজ কি দেখিতেছ, কাল আরও দেখিবে। পরদিন ভোরে চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছিলাম। স্টেশনে নীরোদবাবু, শশীবাবু* উপস্থিত।

জ্যোতিষকে এক সার্ট গায়ে ও চটি পায়ে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল — ব্যাপার কি? অবশেষে স্টীমার স্টেশনে যাইয়া

* শশীভূষণ দাসগুপ্ত — চট্টগ্রামের ফটোগ্রাফার।

কক্স বাজার রওনা হওয়া হইল। স্টীমার কতদূর যাইয়া সমুদ্রে পড়িল। আর খুব দোলায়িত হইতে আরম্ভ হইল। এ শরীরের পড়িয়া থাকার ভাবটি তখনও বেশ ছিল। স্টীমারে উঠিয়াই শুইয়া পড়িল। সকলে বলাবলি করিতেছে এইরূপ দোলায়িত অবস্থা ৫/৬ বছরের ভিতর দেখি নাই। বৃষ্টি বাতাস ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। স্টীমারের উপর জল এদিক ওদিক গড়াইতে লাগিল। এ শরীরটাও এলাইয়া পড়িয়া আছে। কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া গেল। দীর্ঘ সময় এ শরীরের অচল, অটল স্থিরভাবে পড়িয়া বা বসিয়া থাকার ভাবটি তখনও বেশী ছিল। উপরে নীচে যাত্রীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সমুদ্রের এই তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া খেয়াল হইতেছিল — অনন্ত জলরাশি তুমুল গর্জনে ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে বিপদের বিভীষিকার ভিতর দিয়া মানুষকে তাঁহার প্রতি শরণাগতি শিখাইতেছে।

কক্সবাজার ঘাটে প্রায় সন্ধ্যায় পৌঁছিলাম। সেখানে একদিন থাকিয়া আদিনাথ আসিলাম। জ্যোতিষ ও সীতানাথ ফিরিয়া গেল। আমি ও বাবা থাকিলাম। ইতিমধ্যে কুঞ্জবাবু ঢাকা হইতে আসিয়া উপস্থিত। জ্যোতিষ ঢাকায় ফিরিয়া ভোলানাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাহার উপর নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। বলিল — তোমাকে তাহার সঙ্গে দিলাম ফিরাইয়া আনিবার জন্য, আর তুমি তাহাকে তোমার দেশে রাখিয়া আসিলে। এইভাবে বহুলোকের সম্মুখে তাহাকে ভৎর্সনা করিল। কয়েক দিনের ভিতরই ভোলানাথ আশুকে সঙ্গে করিয়া আদিনাথে আসিয়া উপস্থিত। এ শরীরের উপর রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করিল।

পরে আমরা কলিকাতা যাই। রাস্তায় ভোলানাথকে বলিলাম — আমার যখন এই রকম ভাব, তুমি আমার চলা ফিরায় বাধা দিও না। ভোলানাথ রাগ করিতে লাগিল, নানা কথার পর আমি বলিলাম, তুমি কসবা কালীবাড়ী বা যে কোন স্থানে এতদিন অপেক্ষা কর। যদি ইহার মধ্যে আমার ভাবের পরিবর্তন হয়, তবে আমি খবর দিব অথবা সেখানে যাইব।

হরিদ্বার, অযোধ্যা, দেরাদুন ও কাশীতে মা

বর্ধমানের টিকিট করিয়া বাবা ও আশুকে নিয়া গাড়িতে উঠিলাম। কুঞ্জবাবুও দেখি যাইতে চায়, তাহাকে বলিলাম তুমি ফিরিয়া যাও। সে প্রথমতঃ মানিয়া নিল। পরে দেখি সঙ্গেই চলিল। বর্ধমানে যাইয়া হরিদ্বারের টিকিট করা হইল, কুঞ্জবাবু বলে আমিও হরিদ্বার যাইব, ৩/৪ দিন থাকিয়া চলিয়া আসিব। হরিদ্বারে ৩/৪ দিন কাটিয়া গেলে দেখি কুঞ্জবাবু আর যায় না।

ইহার ভিতর এ শরীরের অন্যত্র চলিয়া যাইবার ভাব জাগিল। তখন শরীরের পিতাকে বলিলাম এখনই আমি কোথাও যাইব। আপনি কুঞ্জবাবুর সহিত থাকুন। ৭ দিনের ভিতর না ফিরিলে আপনি কাশী চলিয়া যাইবেন।

হরিদ্বার স্টেশনে গিয়া একটি বাঙ্গালী টিকিট কালেক্টরের সহিত দেখা হইল, সে আমাদিগকে অযোধ্যার টিকিট আনিয়া দিল ও গাড়ীতে তুলিয়া দিল। সে সময় খাওয়া ছিল সামান্য সরবৎ, ফল ইত্যাদি। তখনো পড়িয়া থাকার ভাব চলিতেছে। আশুকে বলিলাম এক স্টেশন আগে ডাকিস্। অযোধ্যার নিকট ভোর রাত্রে পৌঁছিলাম। দেখিলাম ৯/১০ জন পাণ্ডা আসিয়া আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাণ্ডার দরকার নাই বলিলে, তাহারা শুনে না, কেবল গোলমাল করে। অবশেষে চলিয়া গেল। অযোধ্যায় একদিন থাকিয়া আবার হরিদ্বার আসিলাম। ঐ টিকিট কালেক্টরটি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাতে তাহার বাসায় উঠিলাম। আমরা ৩/৪ দিন সেখানে রহিলাম। টিকিট কালেক্টর ও তাহার স্ত্রী খুব যত্ন করিতে লাগিল। একদিন বৌটি বলে — আপনাকে দেখা অবধি আমার কেমন উদাস ভাব হইয়াছে। সংসার আর ভাল লাগে না। তাহাকে বলিলাম যখনকার যে কাজ তাহা গুছাইয়া করিতে হয়। তোমার পতিসেবাই এখন ধর্ম। সময়ে সব হইবে।

একদিন বেড়াইতে গিয়া রাস্তায় কয়েকজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত দেখা হয়, তাহারা আমাদিগকে ভোলাগিরি ধর্মশালায় নিয়া গেল। কিছুতেই আসিতে দিবে না। সেখানেই রহিলাম। শরীরের পিতা ও কুঞ্জবাবুর সহিতও দেখা হইল। পরে একদিন গোপীবাবু ও উপেনবাবু আসিয়া বলে যে দেরাদুন রায়পুরে সহস্রধারা আছে, আপনার ইচ্ছা হইলে একবার দেখিয়া আসিতে পারেন। সকলে মিলিয়া সেখানে যাওয়া হইল। সহস্রধারা হইতে হরিদ্বার ফিরিবার সময় কুঞ্জবাবু খুব পীড়িত হওয়াতে তাহার ছেলেকে আসিবার জন্য বেনারসে তার করা হইল।

ঢাকা হইতে এ শরীর যখন বাহির হয়, তখন সেখানে থাকিবার জন্য কুঞ্জবাবুকে বলা হইয়াছিল। সে তাহাই করিয়াছিল। পরে আবার কি মনে করিয়া আদিনাথ গেল। সেখান হইতে আর এই শরীরের সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। বার বার কাহাকেও কিছু বলিবার ভাবও এ শরীরে হয় না। কিন্তু কথা না মানিয়া চলিলে কোন না কোন সময় তাহাকে সাময়িক একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। কুঞ্জবাবুকেও এই অসুখে অনেকদিন ভুগিতে হইয়াছিল।

এ শরীর যখন সহস্রধারা হইতে ফিরিয়া আসে, তখন পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিকের স্থানগুলি দেখিয়া খেয়াল হইয়াছিল — আবার এখানে আসিতে হইবে। আমরা পরে বেনারসে নির্মলবাবুর বাসায় যাই। ২/৩ দিন থাকিয়া জিতেনকে সঙ্গে করিয়া বিন্ধ্যাচল গেলাম। তথায় আবার নির্মলবাবুর স্ত্রী আসিয়া খবর দেয়—এই শরীরের পিতার খুব অসুখ, বেনারস ফিরিয়া চল। এ শরীরের যাইবার বিশেষ খেয়াল হইতেছে না বলাতে সে বলিল — তুমি যে সময় আমাদের বাসা হইতে আসিয়াছ তাহা গৃহস্থদের পক্ষে অশুভ ছিল। আবার যাইয়া তোমাকে যাত্রা বদলাইতে হইবে। আমি তোমাকে না নিয়া যাইব না। অনেক কান্নাকাটি করিতেছে। এই শরীর বলিল — আচ্ছা, বল কত সময় থাকিলে তোমার গৃহের অমঙ্গল দূর হইবে বলিয়া তোমার মনে হয়। সে বলিল — তোমার যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ থাকিও। তাহাদের সঙ্গে বেনারস যাই। একদিন সন্ধ্যার সময় কীর্তন হইলে পর কথাবার্তা হইতেছে হঠাৎ খেয়াল হইল এখনই কলিকাতা যাইব। সকলে অবাক। যাইতে দিবে না বলিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। এ শরীর বলিল — যাইবই। এই বলিয়া জিতেনকে নিয়া চলিয়া আসিলাম। কলিকাতায় গিরীনের বাসায় ২/১ দিন আছি। একদিন গিরীন বলে, নবদ্বীপে যে সাধু দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আর একবার দেখিলে হয়।

নবদ্বীপের মৌনীবাবা

এক বছর পূর্বে ভোলানাথ সহ আমরা কয়েকজন নবদ্বীপ গিয়াছিলাম। সে সময় এক মৌনীবাবা তথায় ছিল। দেখা গেল একখানি কোঠায় এক লক্ষ্যে একজন বসিয়া আছে। আল্‌গা ঢাকা একখানি চাদর, পিছনে বড় এক তাকিয়া। মশারি টাঙ্গান ও দরজা বন্ধ। দুইটি জানালা আছে, তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে হয়। এ শরীর পলকশূন্য অবস্থায় তাহার দিকে কতক্ষণ চাহিয়া রহিল। ভোলানাথ আমাকে ডাকিয়া নিল, পাছে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার জন্য এ শরীরের অবস্থার পরিবর্তন হয়। কোন সময় এ শরীরের এইরূপ হইত যে এক লক্ষ্যে পলকশূন্য ভাবে দেখিতে দেখিতে শরীর একেবারে স্থির হইয়া যাইত। তখন হাজার ডাকাডাকি পীড়াপীড়ি করিলেও কেহ সাড়া পাইত না। কোন সময় চোখ বুজা অবস্থায়ও শরীর অবশের মত হইয়া অনেক সময় এইভাবে কাটিয়া যাইত। আপনা হইতে না উঠিলে কাহারও তুলিবার সাধ্য হইত না। পূর্বে এইরূপ হইত যে কোন কোন সময় যে কোন সূত্র ধরিয়া বাহির ভিতর স্থিররূপ প্রকাশ হইয়া ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত।

মৌনীবাবাকে দেখিয়া কেহ বলে মানুষ, কেহ বলে কৃষ্ণনগরের পুতুল ইত্যাদি নানা রকমের আলোচনা হইল। এ শরীর কিন্তু তাহার পেটে ও বুকে শ্বাসের গতি দেখিয়াছে। ইতিমধ্যে এক বৃদ্ধা আসিল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল — বাবা কখন উঠেন? কি খান? সে বলে উঠিতে ত দেখি না। খাওয়াও নাই বলিলেই চলে। ১৫/২০ দিন পর একটু দুধ মুখে ধরিলে কখনও নেন, কখনও নেন না। বৃদ্ধা বলিল ৩ বছর যাবৎ এইভাবে আছেন। বাহ্য প্রস্রাব নাই, আরও কত কি! জানলায় দর্শনের সময় ৮টা হইতে ৯টা, ১০॥ হইতে ১১টা, আবার ২॥ টা হইতে ৭টা জানালা খোলা থাকে। মৌনীবাবা সম্বন্ধে সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। দেখিলাম, অনেকেরই তাঁহার উপর চমৎকারিত্ব ও ভক্তির বেশ একটি ভাব। এ শরীর কাহারো ভাব নষ্ট করে না; কারণ সকলের মধ্যে এক ভগবানই ত আছেন। যাহার যেইভাবে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। যে যতটুকু শুদ্ধভাবে অগ্রসর ও স্থায়ী হয়, ততটুকুই ভাল। যে যাহা

দেখে বা শুনে তাহা সত্য হওয়া চাই, নতুবা পরে সাধারণের ক্ষতি হয়। বলিলাম — এই সাধু তোমাদের মুখে তাহার সম্বন্ধে মাটির পুতুল পর্যন্ত বাহির করিয়াছে। তাহার দৃষ্টি স্থির, এক আসনে একভাবে পলকশূন্য অবস্থায় বসিয়া থাকা কম কথা নয়। এ শরীরের ভিতর বার বার উঠিতে লাগিল যে সে সব করে। কথাও বলে।

গিরীনের মুখে এইবার নবদ্বীপ যাইবার ইচ্ছা শুনিয়া বলিলাম — বেশ। সঙ্গে জিতেন, গিরীন, তাহার স্ত্রী ও ভাইয়ের বৌ। বিকালে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া মৌনীবাবার আশ্রমে উঠি। দেখি ঠিক পূর্বেকার মত ঐ ভাবে বসিয়া আছেন। কিন্তু শরীর দুর্বল ও মশারিটি নাই। সকলে দেখিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসার কথা বলে। এ শরীর বলিল — তোমরা যাও, আমি এখানে থাকিব। তাহারাও সে রাত্রি রহিল। পরদিন আমাকে ও গিরীনের ভাইয়ের বৌকে রাখিয়া তাহারা কলিকাতা চলিয়া গেল।

এ শরীর বসিয়া আছে, খানিক পরে বৃদ্ধাটি আসিয়া আমাকে পাশের একটি ঘরে থাকিতে বলিল। আমরা দুইজন সেখানে গেলাম। ঐখানে বসিয়া দেখি কি সাধুর ঘরের আর এক দুয়ারে বেশ ভালো বিছানাপত্র রহিয়াছে ও একটি মেয়েমানুষ সেই ঘরে বালতি বালতি জল নিতেছে। আমরা আর তত খেয়াল করিলাম না। আবার সেদিকে চোখ পড়িতে দেখিলাম বিছানা নাই। ঘরের দরজাও বন্ধ। কেবল জানালা দুইখানি খোলা। সাধু পূর্বের মত আসনে বসিয়া আছে। গিরীনের ভাইয়ের বউ বেড়াইতে বেড়াইতে তাহাদের ঘরে গেল, শুনিল ঐ মেয়েমানুষটি মৌনীবাবার জন্য রান্না করিতেছে। কতক্ষণ পর বেলা হইয়াছে বলিয়া মৌনীবাবার ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিল এবং মেয়েটি খাবার নিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। পরে মেয়েটিকে তাহার খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল — আমি প্রসাদ পাইয়াছি।

অপর একটি স্ত্রীলোক মৌনী সাধুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়া আমাকে জানায় যে মৌনী সাধুর সঙ্গে যদি কথা বলিতে চাও, এই সময়। এই বলিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গেল। মৌনীবাবা আমার সঙ্গে আলাপ করিতে আরম্ভ করিল। আমাকে বলে — তুমি ঘুরিয়া বেড়াও কেন? বলিলাম — তুমিই বল। সে বার বার বলে —

দেখ না, আমি কেমন বসিয়া থাকি। এইরূপে অনেক কথাবার্তা হইল, পরে তাহার আসনে বসিবার সময় আসিল। বলিলাম — এখন ত তুমি সাজ পোষাক পরিয়া সকলকে দর্শন দিবে, তবে আমি যাইব কি? বলে — না। আমি চলিয়া আসিলাম।

বারান্দায় বসিয়া আছি। তখন আমার খেয়াল হইল যে ইহারাও বুঝে বাবা কথা কয় না, এইভাবে সর্বক্ষণ থাকে। ইহাও মিথ্যাচার। তাই দেখা যায় সাধুর যতটুকু সদ্‌বৃত্তি তাহাও মিথ্যার প্রভাবে শেষে ঢাকিয়া পড়ে।

দেখিতে দেখিতে বেলা চলিয়া গেল। বৃদ্ধা আসিয়া সাধুর ঘরের জানালা বন্ধ করিল। সাধু আমাকে ডাকিয়া নিল। তাহার কত শিষ্য আছে, ঐ মেয়েটি তাহার শিষ্যা ইত্যাদি অনেকক্ষণ বুঝাইল। পরের দিন দেখিলাম মেয়েটি সকাল সকাল রান্না করিতেছে এবং শুনিলাম গত রাত্রে মৌনীবাবা রাগ করিয়া খায় নাই। মৌনীবাবাকে খাওয়াইয়া তাহার ঘরের জানালা খুলিয়া দিল। বেলা হইলে আবার যখন জানালা বন্ধ করিল, মৌনীবাবা আমাকে ডাকিয়া, তাহার জীবনের অনেক বিষয় জানাইল এবং বৃদ্ধা ও তাহার শিষ্যাটিকে বলিল, তোমরা বলিয়াছিলে — মাথা গরম একটি মেয়ে আসিয়াছে। এখানে থাকিবে বলিয়া থাকিল। সে আসল পাগল, তোমরা চিন না। পরে আমাকে বলিল — সকলে তোমাকে মা বলে, তবে তুমি আমারও মা। বলিলাম — আমি তোমার মেয়ে। সে বলিল না, তাহা হইতে পারে না। তুমি তোমার আপন মুখে বল — 'তুমি আমার ছেলে'। পরে তাহাকে বলিলাম — আচ্ছা! কিন্তু তোমার এইসব মিথ্যাচার ত ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, মা! আমি আর এখানে থাকিব না। তুমি বেশ আছ, ঘুরিয়া থাকাই ভাল। বলিলাম — এ শরীর ইচ্ছা করিয়া ঘুরে না; যাহা আপনা হইতে হইয়া যায়। বৃদ্ধা ও সে শিষ্যাটি বলিল — এত শিষ্য, এত ভক্ত, কিন্তু তোমার সহিত যেইরূপ প্রাণখোলা কথাবার্তা হইল, এই রকম ত দেখি নাই। সাধু আমাকে বলিয়া দিয়াছিল — তোমার যখন ইচ্ছা আসিও। তাহার পরদিন আমি তাহার ঘরে খবর না দিয়াই গেলাম, দেখি মেঝেতে শীতল পাটী, বালিশ ও পরিষ্কার বিছানা। পরণে শান্তিপুরী ধুতি। আমাকে তাহার শিষ্যাটি বলিয়াছিল তাহার টাকার অভাব, তাই আজকাল পুষ্টিকর খাইতে না পারিয়া শরীর শুকাইয়া

গিয়াছে। অথচ দেখিলাম তাহার চারিবেলা আহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আসিবার সময় তাহাকে বলিলাম — সকলে মৌনীবাবা বলে, আমার কিন্তু খেয়াল হইয়াছিল, তুমি কথা কও। তোমার সহিত দেখাশুনা হইয়া গেল, এখন যাই। সে বলিল — মনে রাখিও মা। ৪/৫ দিন থাকিবার পর গিরীন আমাকে আনিতে গেল। গিরীন রাস্তায় বলিল — মা! এ কেমন মৌনী? আমি ত তাহার ব্যাপার দেখিয়া অবাক। এখন ত তুমি তাহার সঙ্গে দেখাও করাইলে, কথাও শুনাইলে।

তাহাকে বলিলাম মানুষের ভালটুকু মাত্র দেখা ও গ্রহণ করা। দোষ দেখিও না। আমরা গিরীনের দেশের বাড়ীতে গেলাম। পরে আবার যখন নবদ্বীপ যাই, শুনিলাম মৌনীবাবা কোথায় চলিয়া গিয়াছে।